তুর্কি সাহিত্যের সেকাল-একাল

ড. এলহাম হোসেন

তুর্কি সাহিত্যের শিকড় বহু প্রাচীন। এর সন্ধান পাওয়া গেছে মঙ্গোলিয়ার ওরখান উপত্যকার স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে খোদাইকৃত লিখনের মধ্যে। এটির উৎপত্তি অষ্টম শতকে। এটি চাইনিজ ও তুর্কি ভাষায় লেখা। এতে তুর্কি জাতির উৎপত্তি, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সোনালী দিকগুলো, চাইনিজদের হাতে পরাজয় এবং পরবর্তীতে ইলতেরিশ কাগান কর্তৃক পুনরুদ্ধারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই খোদাইলিপি কাব্যিক, ছন্দময় ও মহাকাব্যের ঢংয়ে রচিত। এই শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ১৮৮৯ সালে। আবিষ্কার করেন নিকোলাই অ্যাড্রিনস্টেভ। এছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক তুর্কি সাহিত্যের নিদর্শনের মধ্যে একাদশ শতকের মাহমুদ কাসগারির লেখা তুর্কি ও আরবী ভাষায় রচিত অভিধান এবং ইউসুফ খাস হাজিবের লেখা *কাতাদগুবিলিক* পুরনো তুর্কি সাহিত্যের প্রভাবশালী নিদর্শন। শেষোক্ত বইটিতে লেখক তাঁর সমসাময়িক কালের সমাজ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিশ্বস্ত চিত্র অংকন করেছেন। তবে আধুনিক তুর্কি সাহিত্য বলতে যা বুঝায়, তার পথচলা শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। এর উৎপত্তি মঙ্গোলীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে। এটি এশিয়া মহাদেশের একেবারে পশ্চিমে। বর্তমান সময়ের তুর্কি ভাষার লালন ও চারণক্ষেত্র এটিই। তারপর ককেশিয়রা এবং সর্বশেষ অটোম্যানরা তুর্কি ভাষা ও সাহিত্যের শরীর গঠন ও তাতে রক্তমাংসের সঞ্চার করে।

অটোম্যান সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষমতা কায়েম করে। অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ওসমান। ওসমান শব্দের ইংরেজি ভাষায় অপভ্রংশই হলো অটোম্যান। আরবী ভাষায় তাঁর নাম ওথমান। তুর্কি ভাষায় এসে দাঁড়িয়েছে 'ওসমান'। তুর্কি ভাষায় অটোম্যান বলতে ওসমানের অনুসারীদের বোঝানো হয়। আর তার্ক (Turk) শব্দটি প্রয়োগ করা হতো আনাতোলিয়ার কৃষক সম্প্রদায় ও নৃগোষ্ঠীকে বোঝাতে। শহুরে শিক্ষিত লোকদেরকেও তাচ্ছিল্য করে তুর্কি বলা হতো। পশ্চিমা বিশ্বে 'অটোম্যান' ও 'তুর্কি'কে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৯২০ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে যখন আংকারা ভিত্তিক সরকার গঠন হয়, তখন তৎকালীন সরকার 'অটোম্যানের' পরিবর্তে 'তুর্কি' শব্দটি গ্রহণ করে জাতীয়তা নির্ধারণী শব্দ হিসেবে গ্রহণ করে। যা'হোক, তুর্কি সাহিত্য বলতে যা বুঝায় তা বর্তমানে আনাতোলিয়া এবং এর আশপাশের বলকান অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্রীভূত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই এই অঞ্চলগুলোতে তুর্কি সাহিত্য গড়ে ওঠে ইস্তাম্বুল শহরকে কেন্দ্র করে।

তুর্কি সাহিত্যের প্রচলিত জান্‌রা বা প্রকরণগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম হলো মহাকাব্য। 'কিতাব-ই-দেদে করকুট' তুর্কি সাহিত্যের প্রাচীনতম মহাকাব্য। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে এর 'দ্যা বুক অব দেদে করকুট' শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। মূল গ্রন্থটি কখন রচিত হয় তা জানা যায় না। তবে এতে বর্ণিত গল্পগুলোর সূত্র থেকে অনুমান করা হয় সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীতে এটি রচিত হয়। কিন্তু এর উৎস-বিবেচনায় মনে করা হয় যে, এর গল্পগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল নবম এবং দশম শতকে। এর গল্পগুলোর ভাষা ওগুজ তুর্কি। মৌখিক রূপ বিবেচনায় এর চমৎকার শৈলী ও শব্দচয়ন পাঠকের বেশ হৃদয়গ্রাহী। বিষয়বস্তুতে আনাতোলীয় এবং আজার বাইজানদের বীরগাঁথার সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয়। এর বারটি

মহাকাব্যিক গল্পে ওগুজ বীরদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, করকুট নামে এক বয়োবৃদ্ধ সাদা শশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি ছিলেন। বেঁচে ছিলেন প্রায় ২৯৫ বছর। ১০০০ সাল থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে। সে-সময় বয়োবৃদ্ধ শশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তিদের গুজদের মধ্যে শ্রদ্ধাভরে ডাকা হতো 'দেদে' বলে। এঁরা গোটা সম্প্রদায়ের কাছে উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হতেন।

'কিতাব-ই-দেদে কারকুট'-এর বারটি মহাকাব্যিক গল্পের বিষয়বস্তু তুর্কিদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরবর্তী সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। গল্পগুলো বীরেরা ধার্মিক মুসলমান, আর ভিলেন বা খলনায়করা সচরাচর অন্য ধর্মাবলম্বী। তবে ইসলাম-পূর্ব যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চিত্রও এখানে বিধৃত হয়েছে। ওগুজদের মূল্যবোধ, ইতিহাস, নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও বিশ্বাস-ব্যবস্থার বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে এটি বিবেচিত হয়। এই মহাকাব্যের অন্যতম প্রধান দিক হলো এতে তুর্কি ও পশ্চিমা মিথ ও ঐতিহ্যের নান্দনিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'গগল আই' দানবের সঙ্গে যে যুদ্ধের বর্ণনা এতে বিধৃত হয়েছে, তা হোমারের *ওডিসির* দানব সাইক্লোপসের সঙ্গে ওডিসিয়াসের যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এভাবে এখানে ইন্টারটেক্স্চুয়ালিটির অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে এ মহাকাব্যের লিখিত পান্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ধারণা করা হয় এর পূর্ব পর্যন্ত মৌখিক আকারে স্থানীয় ওজান বা আসিকদের মুখে মুখে এটি সংরক্ষিত হয়। তুর্কি ভাষায় কবিকে 'ওজান' বা 'আসিক' বলা হয়।

ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই 'ওজান' বা 'আসিক'রা তুর্কি কবিতাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় এর সঙ্গে মরমীবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শহুরে গান বা সারকির বেশ উন্নতি সাধিত হয় রাজদরবারের কবিদের হাতে। এই গান গেয়ে সভাসদদের বিনোদন দেয়া হতো। এর সঙ্গে অবশ্য গ্রামীণ *বাগলামা* গানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এর সমৃদ্ধি আরো বাড়ানো হতো। সপ্তদশ শতকের কবি না ইলি প্রথম এ গানগুলোকে তাঁর সংগ্রহসমগ্রে অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে রাজদরবারে গজল বেশ জনপ্রিয় ছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, এই গজল ও কবিতা ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সাধারণ মানুষ ও অভিজাতদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন রচনা করেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে সূফি ঘরানার কবিতার ব্যাপক বিস্তার লাভ ঘটে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের জনপ্রিয় সূফি কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'জনের নাম বেশ পরিচিতি লাভ করে। এরা হলেন আসিক পাশা ও ইউনুস এমরি। আসিক পাশার *গরীবনামা* এগার হাজার শ্লোক নিয়ে রচিত উপদেশধর্মী কবিতা। মহাকাব্যিক আকারের গ্রন্থ। আকারে মহাকাব্যিক এজন্য যে, *রামায়ণ*-এ যেখানে আছে বার হাজার শ্লোক, সেখানে এ কবিতায় আছে এগার হাজার শ্লোক। তবে বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি আদৌ মহাকাব্য নয়। কিন্তু এর দার্শনিক গভীরতা পাঠককে মুগ্ধ করে। ইউনুস ইমরি রচনা করেন *মসনবি রিসালাত উনুশিয়ে*। তিনি আনাতোলিয়া ও বলকান অঞ্চলের পল্লী সাহিত্যের উপকরণের দ্বারা প্রভাবিত হন। আনাতোলিয়ায় প্রচলিত তুর্কি ভাষা বেছে নেন সাহিত্য রচনার জন্য। আজারবাইজান থেকে শুরু করে বলকান অঞ্চলসমূহের সর্বত্রই তিনি সমান জনপ্রিয়। তাঁর রচনা ইসলামী ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার রসে সিঞ্চিত।

তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সূফি দর্শনের বিপরীত স্রোতও বইতে শুরু করে। ইউনুস এমরির মতো এসরে ফগলুও আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করলেও কেইগুসুজ আবদালের কবিতায় সেক্যুলার ভাবনার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার স্রোতের বিপরীতে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা কেইগুসুজ আবদালের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে ধর্মীয় ধারার কবিতার চর্চা দেখা যায় ইব্রাহিম গুলসানি, তাঁর ছেলে সৈয়দ সাইফুল্লাহ নিজামগলু এবং আজিজ মাহমুদ হুদায়ীর মধ্যে। ষোড়শ ও সপ্তদশ

শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক কবিতাগুলো রচনা করা হতো মূলত সূফিদের 'ধীকর' উৎসবে পাঠ করা বা গাওয়ার জন্য। 'ধীকর' উৎসব মূলত উৎসব হলেও এতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য থাকে। এতে নাচ, গান, অভিনয়, কবিতা পাঠ, বিশেষ ধরনের প্রতীকী পোশাক পরিধান করে নাচ-গান ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এটি শুধু তুর্কিদের নয়, সব মানুষের মৌখিক সাহিত্য ও শিকড়ের কাছাকাছি যাওয়ার মনোবাসনারই প্রতীকী উৎসব। এই সময়ের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বকারী কবি হলেন নিয়াজি মিসরি। নিয়াজি মিসরি সপ্তদশ শতকের হালভেতেয়ী তরিকার কবি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে তাঁর কবিতা দারুণ জনপ্রিয় ছিল। কবি হিসেবে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা হলো, তিনি খুব সহজ ও সাধারণ শব্দমালা ব্যবহার করে অতিইন্দ্রীয়তার অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরতে পারেন। এ-কাজটি ইংরেজ রোমান্টিক কবিরাও করেছেন।

তবে অটোম্যানদের রাজত্বকালে গজল বেশ জনপ্রিয় সাহিত্যরূপ হিসেবে পাঠকাদৃত ছিল। কাসিদাও ছিল গজলের মতই জনপ্রিয়। এগুলো সাধারণত শ্লোকের আকারে লেখা হতো। বিষয়বস্তু ছিল একক। বৈচিত্র্য ছিল না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ ব্যবহার করা হতো। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গজলগুলো পাঁচ থেকে দশটি শ্লোকে লেখা হতো। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে এটি পাঁচেই নির্ধারিত হয়। গজলের সেটিং প্রধানত হতো বাগান। ফুল, পাখি, গান ইত্যাদি ছিল এর বিষয়বস্তু। গজলে সাধারণত প্রেমিক তার প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে প্রশংসাবাণী ও প্রেমের প্রস্তাব নিবেদন করে। তবে ধর্মীয় গজলে স্রষ্টা-প্রেমই প্রধান বিষয়। কাসিদাগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু-প্রকার ছিল। এক প্রকার কাসিদা ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে স্পন্দিত হতো। আর এক প্রকার কাসিদা বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেক্যুলার ছিল। ধর্মীয় কাসিদাগুলোতে আল্লাহ, হযরত মুহম্মদ, হযরত আলীর প্রশংসা করে লেখা হতো। সেক্যুলার কাসিদাগুলোতে সুলতান, উজির, অভিজাত ব্যক্তি প্রমুখের প্রশংসা করা হতো। তবে কাসিদাগুলোতে একাদশ শতাব্দীতে ফেরদৌসি রচিত শাহনামার প্রভাব স্পষ্ট। বিষয়বস্তুতে নয়, রচনা-কৌশলে। শাহনামার কল্পচিত্রের অনেক কিছুই কাসিদাতে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য সমৃদ্ধ কাসিদাতে কোরান ও হাদিস থেকে অনেক অ্যালুউশন বা উদ্ধৃতির উল্লেখ থাকতো। কাসিদার রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর শেষের দিকের শ্লোকে লেখক তাঁর নাম উল্লেখ করে নিজের কাব্য-দক্ষতার প্রশংসা করতেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা কামনা করতেন। কাসিদাগুলোতে গজলের উপকরণও ব্যবহৃত হতো। দৈর্ঘের দিক থেকে কাসিদা কখনো চৌদ্দ শ্লোক নিয়ে গঠিত হতো। আবার কখনো এতে একশ শ্লোকও সন্নিবেশিত হতো। আমাদের বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে পল্লী সাহিত্যে বা ফোক লিটারেচারেও লেখার মধ্যে লেখকের নামের উপস্থিতি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, লালনের গানে আছে; শাহ আবদুল করিমের গানেও আছে। আসলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাহিত্যের নানান ধারা-উপধারার মধ্যে ইন্টারটেক্স্টুয়ালিটি মানুষের জীবন-জীবিকার তাগিদে রূপায়িত 'মাইগ্রেটরী ন্যাচার' বা অভিবাসী হওয়ার প্রবণতা থেকেই তৈরি হয়েছে।

একথা সত্য যে, অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় কবি-সাহিত্যিকরা শাসকশ্রেণির আনুকূল্য লাভ করে। আর্থিক সাহায্য, বাৎসরিক ভাতা এবং রাজদরবারে পদ-পদবীও কবিদের অনেকেই লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় সুলতান মাহমুদের রাজত্বকালে (১৪৫১-৮১) কবি ইসা নিকেতি সুলতানের আনুকূল্য পেতে সক্ষম হন। সুলতান তাঁর গজলে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর বিচারালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি হায়ালি বে, যিনি প্রথম দিকে দরবেশের বেশে ঘুরে বেড়াতেন, তিনি উজির ইবরাহীম পাশার নজরে আসেন। তাঁর মাধ্যমে প্রথম সুলতান সুলেমানের রাজানুকূল্য লাভ করেন।

সুলতান তাঁকে একটি ভালো অংকের বাৎসরিক ভাতা বরাদ্দ করেন। আবার কোনো মেধাবী কবি যদি মাদরাসা থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করতেন, তবে রাজানুকূল্যে তিনি মুলাজিম বা সহকারী অধ্যাপক বা মুদার্‌রিস বা অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পেতেন। কেউ কেউ বুরোক্র্যাট বা আমলা হওয়ারও সুযোগ পেত। তবে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ১৫৭৪ সালে ক্ষমতায় আরোহণের পর কবিদের সুবিধাপ্রাপ্তিতে ভাটা পড়ে।

তবে ১৮৩৯ সালে তানজিমাত সংস্কারের মধ্য দিয়ে তুর্কি সাহিত্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। এই সংস্কার প্রক্রিয়া শেষ হয় ১৮৭৬ সালে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিকড় ঠিক রেখে তুর্কি অটোম্যান ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাসমূহের আধুনিকায়ন করা। এর আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেটা হলো, অটোম্যান সাম্রাজ্যের নানান স্থানে যে বিচিত্র নৃগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলো বাস করছে, তাদেরকে একটি একক স্পৃহায় বা উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করা। এই স্পৃহা হলো জাতীয়তাবাদের স্পৃহা। এতে করে অটোম্যান বুদ্ধিজীবীরা ইসলাম ধর্মের কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যকে মিলিত করার চেষ্টা করলেন। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৮৩৮ সালে বাল্টা লিম্যান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় অটোম্যানদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের। এই সংস্কারের ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলামী শরিয়াহ আইনের পরিবর্তে সেক্যুলার আইন প্রণয়ন করা হয়। জীবনযাপন পদ্ধতিতে ইউরোপীয় চিন্তা-ভাবনা ও ধরন-ধারণের স্পষ্ট প্রভাব পড়ে। এই প্রভাব শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতেও পড়তে থাকে ব্যাপকভাবে। ইব্রাহিম সানসি এই সময়ের প্রভাবশালী সাহিত্যিক। লেখাপড়া করেন ফ্রান্সে। ফিরে এসে কনস্টান্টিনোপালে তাসভির ইফকার নামে পত্রিকা বের করেন। সাংবাদিক ও অনুবাদক হিসেবে নাম কুড়ান। তুর্কি ভাষায় নাটক *Sairevlenmesi* যার ইংরেজি নাম *The Wedding of a Poet* লিখে আধুনিক নাট্যকার হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন ১৮৫৯ সালে। তুর্কি সাহিত্যের আধুনিকায়নে তিনি জিয়া পাশা ও নামিক কামালকে উৎড়ে যান। জিয়া পাশা স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকাকালীন জেনেভায় একটি ব্যাঙ্গাত্মক নাটক লেখেন। এর নাম *জাফরনামা*। সিনাসি ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে তাঁর পত্রিকা *তাজভির এফকার*-এর দায়িত্ব নেন নামিক কামাল ১৮৬৫ সালে। পরবর্তীতে তিনিও তুরস্ক ত্যাগ করে লন্ডনে চলে যান। সেখান থেকে *হ্যারিয়েট* নামে একটি পত্রিকা বের করেন। নামিক কামাল কবিতা ও থিয়েটারের আধুনিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক *Vatan, Yahut, Silistre*. এটি রচিত হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৭৬ সালে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকে নামিক কামাল বাকি জীবন স্বেচ্ছানির্বাসনেই কাটান। সুলতানের সেন্সর বোর্ডের কঠোরতার কারণে অটোম্যান সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

তবে অটোম্যান সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে, ১৮৭৫ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে। আহমেত মিতহাতের হাত ধরে সাহিত্যের এই শাখা পথ চলতে শুরু করে। তবে শুরুর দিকের উপন্যাসগুলো কবিতার মতই উপদেশাত্মক ভূমিকা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। তেভফিক ফিকরাত এ সময়ের প্রধান সাহিত্য-কণ্ঠে পরিণত হয়। তাঁর কবিতাগুলো রোমান্টিসিজমের আফিমের প্রভাব থেকে বের হয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমালোচনার বজ্রনিনাদে পরিণত হয়।

আধুনিক তুর্কি সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার যাত্রা শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। পূর্ববর্তী শাসকদের আরোপিত সেন্সর বোর্ড এ সময় অনেকটা শিথিল হয়। এই

সুযোগেই আধুনিক তুর্কি সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। এ সময় সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন চোখে পরে। নাজিম হিকমাত, আহমেদ এইচ তানপিনার, ইয়াসির কামাল, বিল্‌গ কারাসু, ওরহান পামুক, সাবাহাতিন আলী, সাইত ফাইক ও মোলিহ সেভদেত আন্দে প্রমুখ আধুনিক তুর্কি সাহিত্যের দিকপাল। ১৯২২ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের আনুষ্ঠানিক পতনের পর তুর্কি জীবনযাপন, সাহিত্য ও নন্দনের ওপর পশ্চিমা সাহিত্য, জীবনযাপন-পদ্ধতি ও বিশ্বাস-ব্যবস্থা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমের অভিযাতে তুর্কি সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণে দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে।

১৯২৩ সালে তুর্কি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তুর্কি সাহিত্য এক নতুন গতি-প্রকৃতি লাভ করে। মেহমেত আকিফ এরসয় তুরস্কের নামকরা কবি, রাজনীতিবিদ, লেখক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর রচিত 'ইসতিকালাল মারসি' ১৯২১ সালের ১২ই মার্চে তুরস্কের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়। তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে এটি ব্যাপক দেশপ্রেমবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে। এ সময় রফিক হালিদ কারে একজন নেতৃস্থানীয় ছোটগল্পকার হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। উপন্যাসও লেখেন। কিন্তু সেগুলো তাঁর ছোটগল্পের তুলনায় তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি পাঠকদের মধ্যে। ব্যাঙ্গাত্মক রাজনৈতিক কলামও লিখতেন। এ কারণে তাকে নির্বাসিত হতে হয়। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত নির্বাসিত জীবনযাপন করেন আনাতোলিয়ায় এবং ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে কাটাতে হয় লেবানন ও সিরিয়ায়।

তবে আধুনিক তুর্কি সাহিত্য যে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হয়ে ওঠে তা ওমর সাইফুদ্দিন, ইয়াকুপ কাদরি কারাস মনগলু এবং রিসাত নুরি গুনতেকিনের লেখায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই সময়ের আর একজন নারী সাহিত্যিক, যিনি ইংরেজিতে বেস্ট সেলার লেখা উপহার দেন, তিনি হলেন হালিদে এদিব আদিভার। তাঁর *দ্য ক্লাউন এ্যান্ড হিজ ডটার* বিখ্যাত বেস্টসেলার গ্রন্থ। ইয়াহিয়া কামাল বায়াতলি (১৮৮৪-১৯৫৮) এ সময়ের আর একজন নামকরা কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর কবিতাগুলোর তন্ত্রে তন্ত্রে ধ্বনিত হয় তুর্কি সঙ্গীতের সুর। তাঁর কবিতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো অটোম্যান যুগের ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যের সেতুবন্ধন। তবে আধুনিক তুর্কি উপন্যাসের স্বার্থক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে যার নামক সর্বজনবিদিত, তিনি হলেন আহমেদ হামদি তানপিনার। ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। সাহিত্য-সমালোচনাও লিখেছেন। কিন্তু তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস তাকে আধুনিক তুর্কি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভে সাহায্য করে। *Saatleriayarlamaenstitusu* তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকের সবচেয়ে জটিল উপন্যাস এটি।

তবে ১৯৩০ ও ১৯৪০ এর দশকের সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি ছিলেন নাজিম হিকমাত। পল্লী সাহিত্যের উপকরণ তাঁর কবিতায় বিদ্যমান। সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর কমিউনিস্ট চেতনা। রাশিয়ান ফিউচারিস্ট কবিদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। তুর্কি ভাষার মাধুর্যের প্রকৃত ব্যবহারকারী নাজিম হিকমাত। তাঁর কবিতা, নাটক ও সিনেমার চিত্রনাট্য সমসাময়িক কবিদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। তবে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে তাঁর লেখা

১৯৩৮ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তুরস্কে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য জেল খাটেন। পরে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। ১৯৬৩ সালে মস্কোতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্পের উৎকর্ষও ঘটছিল তুর্কি সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীতে। সাইত ফাইক আবাসিয়ানিক এবং সাবাহাতিন ছোটগল্পে স্ট্রীম অব কনশাসনেস টেকনিক ব্যবহার করে এতে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করেন। এরা সামাজিক বিষয়-আশয় ও সাধারণের জীবনযাপনের ওপর আলোকপাত করেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও তা সাধারণ মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পেছনের চালিকাশক্তি ছিল তুর্কি রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা। এর ফলে গ্রামের মানুষ শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও বোধ তৈরি হয়। তখন সাহিত্যিকরা এই বিস্তৃত পাঠককে তাদের সঙ্গে যুক্ত করার তাগিদ বোধ করে। এই বোধ থেকেই তারা বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রকরণ ও চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনবত্বের আবির্ভাব ঘটান। এ কাজে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আছেন ইয়াসের কামাল। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *তেনেকি* (১৯৫৫) যার ইংরেজি অনুবাদ *Memed, My Hawk* শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক পাঠক মহলেও তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া তুরস্কের সামাজিক বাস্তবতার বিশ্বস্ত ছবি সম্বলিত তাঁর ছোটগল্পগুলো অত্যন্ত পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। পুঁজিবাদী তৎপরতা যে একটা জাতির মনমস্তিষ্কের আধুনিকায়নের পথে প্রধান অন্তরায়, তাও তিনি তাঁর লেখনিতে বলতে ছাড়েননি।

দিন গড়িয়েছে; শাসক-শোষকগোষ্ঠী যতই সাধারণ মানুষকে নিজেদের ফায়দা হাসিলের কাঁচামালে পরিণত করতে চেয়েছে, তুরস্কের সাহিত্য ততই জীবনমুখী হয়ে ওঠেছে। ফলে, লেখক-সাহিত্যিক নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে। তাদের কণ্ঠরোধের সব অপচেষ্টা, নিপীড়ন, নির্যাতন উপেক্ষা করেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এঁরা বিপন্ন মানুষের কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। এমন লেখক-সাহিত্যিকদের আর একজন হলেন আদালেত আগাউগুলু, যিনি ১৯৭১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর অমানবিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন। তারপরও তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। সমাজ-পরিবর্তনের নানান উপষঙ্গ ও সেক্সুয়ালিটি বিশদভাবে এসেছে এই নারী ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের ক্যানভাসে। আর একজন নারী ঔপন্যাসিক সেভগি সয়সালও ওই একই সময়ে তুরস্কের সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভুত হন। তিনিও ১৯৭১ এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর জেল খাটেন। তবুও তিনি নিপীড়িতের কণ্ঠস্বরে পরিণত হন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস উড়ুমেক-এ স্ট্রীম অব কনশাসনেস টেকনিক ব্যবহার করেন। সেক্সুয়ালিটি নিয়ে উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখতে গিয়ে তিনি বেশ সাহসিকতার পরিচয় দেন। ১৯৭৬ সালে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু তাঁর ক্যারিয়ারের অকাল সমাপ্তি ঘটায়।

এছাড়া এই সময় বিলগি কারাসু, কবি আত্তিল আলিহান সেজাই কারাকক প্রমুখ উপন্যাস ও কাব্য রচনায় তুরস্কের ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের নানান উপষঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন স্থানীয় সাহিত্যে।

তবে একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এসে যে দু'জন ঔপন্যাসিক জীবন অন্বেষায় আলোড়িত তুরস্কের সাহিত্যকে অন্যমাত্রা দিয়েছেন, তাঁরা হলেন ওরহান পামুক ও লতিফ তেকিন। ওরহান পামুক ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। সারা বিশ্বের প্রায়

তেষট্টিটি ভাষায় তাঁর বই অনুবাদ হয়েছে। এক কোটি ত্রিশ লাখেরও বেশি বই বিক্রি হয়েছে তাঁর। *সাইলেন্ট হাউজ, দ্য হোয়াইট ক্যাসেল, দ্য ব্ল্যাক বুক, দ্য নিউ লাইফ, মাই নেইম ইজ রেড, দ্য মিউজিয়াম অব ইন্নোসেন্স, অ্যা স্ট্রেজনেস ইন মাই মাইন্ড, দ্য রেড হেয়ারড ওয়োম্যান* ইত্যাদি তাঁর নামকরা উপন্যাস। পামুকের উপন্যাসে তুরস্কের অতীত ও বর্তমানের এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধনের চিত্র পাওয়া যায়। গভীর জীবনবোধ, বাস্তবতার গভীরে ডুব দেয়ার অসাধারণ সামর্থ্য আর মানব মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাকে জাতীয়তার গন্ডি পেরিয়ে একান্তভাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্য স্রষ্ঠায় পরিণত করেছে। অপরদিকে পামুকের সমসাময়িক নারী সাহিত্যিক লতিফ তেকিন তাঁর উপন্যাস ও নাটকে আনাতোলীয় ফোক সাহিত্য থেকে উপকরণ ব্যবহার করেন। যাদু বাস্তবতার ব্যবহার তাঁর লেখনিকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। *ডিয়ার শ্যামলেস ডেথ* তাঁর উপন্যাসগুলোর অন্যতম। গ্রামীণ মানুষদের জটিল ও দুর্ভেদ্য দর্শন, ধর্ম ও বিশ্বাস-ব্যবস্থার ডিকনস্ট্রাকশন বা বিনির্মাণ করেছেন লেখক তাঁর আপন ঐতিহ্য-চেতনা মাথায় রেখে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে তুর্কিদের পরিচয়বোধ, যা পশ্চিমের অভিযাতে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারানোর ভয়ে টটস্থ, তার বস্তুবাদী সাহিত্যবীক্ষার উপস্থাপনা লতিফ তেকিনের লেখনির পরতে পরতে গেঁথে আছে।

যা'হোক তুর্কি সাহিত্য ইতিহাস-ঐতিহ্যের অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে তার দ্ব্যর্থহীন মৌলিকতা প্রমাণ করে বিশ্বসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এখানকার কবিতায় আছে যেমন শব্দের মাদকতা ও ভাবের বিশুদ্ধতা, তেমনি এর উপন্যাস, নাটক ও ছোটগল্পের ভাঁজে ভাঁজে ধ্বনিত হয় মানুষের চিরন্তন বাণী। এ বাণী আহ্বান করে এখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চেতনার ও মননের অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করার। এই আহ্বান সারা বিশ্বের সবার কাছে, আমাদের কাছেও।